# নববর্ষ আগামী সপ্তাহে? না, আগামী কাল

*জহর সরকার*

অনেকেরই বিশ্বাস, ভারতের নববর্ষ— সাহেবি নিউ ইয়ার নয়, নিজস্ব নববর্ষ— দেশের সর্বত্র বৈশাখ মাসেই শুরু হয়। কথাটা ঠিক নয়। অনেক এলাকাতেই নতুন বছর শুরু হয় একটু আগে, চৈত্রের শুক্লা প্রতিপদে। মহারাষ্ট্রে এবং গোয়ায় এই নববর্ষের নাম গুড়ি পড়বা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা আর কর্নাটকে উগাড়ি, সিন্ধিরা বলেন চেটি চন্দ। পশ্চিম ভারতে এই সময় রবিশস্যের ফসল তোলার সময় হয়, তাই এটা উৎসবের কাল। লোক-উৎসবে ধর্মের প্রবেশ অনিবার্য। ব্রহ্মাপুরাণে বলা হয়েছে, প্রলয়প্লাবনের পরে এই দিন বিধাতা বিশ্ব সৃষ্টি করেন। চৈত্রের এই শুক্লা প্রতিপদ প্রায়শই ২২ মার্চ মহাবিষুবের (স্প্রিং ইকুইনক্স) কাছাকাছি সময়ে পড়ে। তবে কাছাকাছি মানে সব সময় গায়ে গায়ে নয়। এ বারেই যেমন এই তিথিটি পড়েছে মহাবিষুবের অনেক পরে, ৮ এপ্রিল, বাংলা নববর্ষের গা ঘেঁষে।

প্রসঙ্গত, কয়েক হাজার বছর ধরে বর্ষগণনায় মহাবিষুবের দিনটি মান্য হয়ে এসেছে। প্রাচীন মিশরীয় ও পারসিকরা এই দিন থেকে বর্ষগণনা করতেন। ইস্টারও এর কাছাকাছি সময়েই পালিত হয়, নবরাত্রিও তাই। এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় বর্ষ শকাব্দের শুরুও এই দিনেই। বলা দরকার, হিন্দুসমাজে জনপ্রিয় পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকায় শকাব্দ স্বীকৃত। তবে সত্যি বলতে কী, যুগ গণনা নিয়ে ভারতের নিজস্ব ঝঞ্ঝাট আছে। হিন্দুরা লক্ষ লক্ষ বছরের মাপে এক একটা যুগের কল্পনা করেছেন। আবার ‘বৈদিক’ নববর্ষেরও একটা ধারণা আছে, যেটি শুরু হয় অগ্রহায়ণ মাসে। ‘ভারতীয় ক্যালেন্ডার’-এর বিবর্তনে আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ভাস্করের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেরও অবদান আছে। তবে এক শতাব্দীর বেশি আগে ব্রিটিশ লেখক এম এম আন্ডারহিল তাঁর দ্য হিন্দু রিলিজিয়স ইয়ার নামের চমৎকার গ্রন্থে বলেছিলেন, ‘হিন্দুদের অনেকগুলি যুগের হিসেব আছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই শক অথবা সম্বত, এই দুইয়ের একটি মেনে চলে’। লোকবিশ্বাস এই যে, উজ্জয়িনীর কোনও এক বিক্রমাদিত্য খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দে বিক্রম-সম্বতের সূচনা করেন। তবে কিয়েলহর্ন-এর মতে, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত এটির বিশেষ পরিচিতি ছিল না। সৌর অথবা চান্দ্র মাসের ভিত্তিতে নানা ধরনের ক্যালেন্ডারের প্রচলন ছিল ভারতে। কোনও একটা সর্বজনীন নববর্ষ স্থির করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সৌর এবং চান্দ্র ক্যালেন্ডারের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে বিভিন্ন উপবাস ও ধর্মাচরণের দিন স্থির করার চেষ্টা অনেক বারই হয়েছে, কিন্তু লাভ হয়নি। অথচ এটা অনেক দিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বছর শুরুর একটা সর্বজনমান্য দিন ঠিক করা দরকার, বিশেষ করে হিসেবনিকেশের খাতিরে।

মজার কথা হল, ভারতের সরকারি ক্যালেন্ডার নির্ধারণের জন্য মধ্য এশিয়ার কাজাখ অঞ্চলের তৃণভূমি থেকে দুর্ধর্ষ শক (ইন্ডো-সিদিয়ান) হানাদারদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এরা আসে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে, তার পর ক্রমে এ দেশেই বসতি করে। এর পরিণামেই ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শকাব্দ গণনা শুরু হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী নেহরু জ্যোতিঃপদার্থবিদ মেঘনাদ সাহাকে একটি সাধারণ ‘ভারতীয় ক্যালেন্ডার’ নির্মাণের দায়িত্ব দেন। বেদ থেকে বিক্রমাদিত্য— অনেক বিতর্কের পরে সাহা কমিটি শকাব্দের পক্ষে রায় দেয় । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওটা এ দেশে চলেনি, ভারতবাসী ধর্ম বা লোকাচারের ব্যাপারে চৈত্র-বৈশাখকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এমনকী সরকারি অফিসাররাও শকাব্দের খোঁজ রাখেন না। শকাব্দ বরং, বিনা পাসপোর্টেই, বালিতে পাড়ি দিয়েছিল, সেখানে তাকে বেশ সম্মানের সঙ্গেই মান্য করা হয়েছে।

আন্ডারহিল পশ্চিম ভারতে চৈত্র নববর্ষের অনুষ্ঠানের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন। একটা হল এই দিন নিমপাতা খাওয়ার প্রথা। এটা নিশ্চয়ই বছরের এই সময় মারাত্মক গুটিবসন্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার

জন্য, যে কারণে এই সময়েই শীতলাপুজোও হয়। এখনও এই দিনে গুড় আর হলুদ দিয়ে নিমপাতা খাওয়ার প্রথা আছে, এতে নাকি রক্ত পরিষ্কার হয়, দেহের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, গুড়ি পড়বা উপলক্ষে ধ্বজা তোলার রীতি। পড়বা কথাটা এসেছে সংস্কৃত প্রতিপদ থেকে। গুড়ি বা দণ্ড হল মরাঠি আচারের বৈশিষ্ট্য, এমনকী গরিব মানুষরাও বাড়ির জানলা থেকে ছোট ছোট লাঠি বের করে রাখেন। তাঁদের বিশ্বাস, সেগুলি অশুভ শক্তিকে দূরে রাখে, ঘরে সমৃদ্ধি আনে। লাঠিগুলি উজ্জ্বল সবুজ বা হলুদ কাপড়ে সাজিয়ে ঝলমলে চুমকি কিংবা মিছরি, নিমপাতা, আমের
ডাল এবং রঙিন ফুলে অলঙ্কৃত করা হয়। মানুষ এই সময় ঘরবাড়ি সাফসুতরো করে দরজায় সূক্ষ্ম সুন্দর রংগোলি আঁকেন।

গুড়ি তোলার সময় মহাবিশ্বের ‘শিব-শক্তি’ নীতির কথা বলা হয়। চিরাচরিত ধারণা হল, এই নীতিই গুড়ি বা দণ্ডের সমস্ত জিনিসগুলিকে অলৌকিক শক্তি গ্রহণের ক্ষমতা দেয়। আমার মনে হয়, ফসল তোলার পরে এবং সুখা মরসুমের শুরুতে মরাঠিরা বিজয়দণ্ড তুলে জানাতেন, এ বার হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার সময়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা, ওড়িশা এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ করে ত্রাস সঞ্চার করত মরাঠি হানাদাররা। এরা ছিল পেশোয়াদের দ্বারা নিযুক্ত প্রধানত দু’ধরনের কৃষক-সৈনিক। এক, শিলেদার, শাসকরা যাদের অস্ত্র দিত, আর্থিক বৃত্তিও। দুই, বর্গি— লুঠতরাজের যা বখরা পাওয়া যায় সেটাই ছিল তাদের আকর্ষণ। এরা ছিল অশ্বারোহী। চৈত্রের পরের সময়টাই ছিল অশ্বারোহী বর্গিদের পক্ষে প্রশস্ত, কারণ শুকনো মাটিতে ঘোড়া ছোটানোর খুব সুবিধে— এক বার বৃষ্টি পড়লেই পূর্ব ভারতে জমি ভিজে নরম হয়ে যায়। গুড়িটা ছিল সম্ভবত একটি সংকেত, চাষিরা যে এ বার বর্গি হিসেবে পূর্বমুখী অভিযানে যোগ দিতে প্রস্তুত, তার সংকেত ।

এই উৎসবের একটা নাম উগাড়ি, সে কথা আগেই বলেছি। উগাড়ি কথাটা এসেছে যুগ আর আদি মিলিয়ে। চৈত্র শুক্লাড়িও বলে একে। বিন্ধ্য পর্বত এবং কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা দক্ষিণ ভারতের চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেন, সচরাচর তাঁরা চৈত্রের এই শুক্লা প্রতিপদ থেকে নতুন বছর গোনেন। সাধারণত দিন শুরু হয় তেল মেখে পুণ্যস্নান দিয়ে, স্নানের পরে প্রার্থনা। কর্নাটকে এই উৎসবের জন্য একটি বিশেষ পদ তৈরি হয়, তার নাম ওবত্তু বা পুরন পোলি। ডাল, গুড় আর তার সঙ্গে ঘি বা দুধ মিশিয়ে রুটির মতো করে গড়া। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানাতেও পুরন পোলি বা পোলেলু এই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। আর একটি অদ্ভুত মিশ্রণ তৈরি হয়, তার নাম উগাড়ি পচ্ঠড়ি। এতে ছ’রকমের স্বাদ থাকে: তেতো নিম, মিষ্টি গুড় কিংবা পাকা কলা, ঝাল কাঁচালঙ্কা বা মরিচ, নুন, টক তেঁতুল আর কটুস্বাদের কাঁচা কম। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এটা একটা ওষুধের মতো। বসন্তঋতু কেবল আনন্দ আর দখিনা বাতাস আসে তা তো নয়, দুঃখও আসে বিস্তর, কারণ এটা হল মারাত্মক সব ভাইরাস এবং অসুখের কাল। উৎসবের খাবার তৈরিতেও সেই বিপদের মোকাবিলার একটা চেষ্টা চলে এসেছে।

বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় উৎসবগুলির কথা যত চর্চা করি, ততই অবাক হয়ে যাই, কী ভাবে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদ এত বিচিত্র রকমের আচার অনুষ্ঠানকে একটা সাধারণ রূপের আঙ্গিকে এনে দিয়েছে। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এ এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। এতগুলো আলাদা আলাদা দিন বা তিথি এবং উৎসব অনুষ্ঠান এত রকমফের, বৈচিত্র তো আছেই। কিন্তু অন্য দিকে ঐক্যও কি কম?

নববর্ষের কথাই ধরা যাক। এত বড় এবং বৈচিত্রময় একটা দেশ, একশো কোটির বেশি মানুষ, অথচ প্রায় গোটা দেশেই নতুন বছর শুরু হয়েছে মোটামুটি একই সময়ে, বড়জোর কয়েক দিনের ব্যবধানে। এটা অবাক করে দেয় বইকী!

প্রসার ভারতীর সিইও, মতামত ব্যক্তিগত